ভাদ্র, ১৩০৭

র বী ন্দ্র না থ ঠা কু র

দুর্বুদ্ধি

ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া, তাহা খোলসা করিয়া বলিব না, আভাস দিব মাত্র।

আমি পাড়াগেঁয়ে নেটিভ ডাক্তার, পুলিসের থানার সম্মুখে আমার বাড়ি। যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগাবাবুদের সহিত অপেক্ষা কম ছিল না, সুতরাং নর ও নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধ রকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।

এই-সকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্য দারোগা ললিত চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু, শশী আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা, তাহাকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। বর্ষে বর্ষে নূতন পঞ্জিকার মতে বিবাহের কত শুভলগ্নই ব্যর্থ হইল। আমারই চোখের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চতুর্দোলায় চড়িল, আমি কেবল বরযাত্রীর দলে বাহির বাড়িতে মিষ্টান্ন খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

শশীর বয়স বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে। কিছু সুবিধামত টাকার জোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড়োঘরে বিবাহ দিতে পারিব, এমন আশা পাইয়াছি। সেই কর্মটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর-একটি শুভকর্মের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম, এমন সময় তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজুমদার আসিয়া আমার হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কতাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছে, শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামি পত্র লিখিয়াছে। এক্ষণে পুলিস তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে ৬উদ্যত।

সদ্য কন্যাশোকের উপর এতবড়ো অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। আমি ডাক্তারও বটে, দারোগার বন্ধুও বটে, কোনোমতে উদ্ধার করিতে হইবে।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনো সদর কখনো খিড়কি দরজা দিয়া অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হন। আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "ব্যাপারটা বড়ো গুরুতর।" দুটো-একটা কল্পিত উদাহরণ প্রয়োগ করিলাম। কম্পমান বৃদ্ধ হরিনাথ শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিল।

বিস্তারিত বলা বাহুল্য, কন্যার অন্ত্যেষ্টিসৎকারের সুযোগ করিতে হরিনাথ ফতুর হইয়া গেল।

আমার কন্যা শশী করুণ স্বরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল।" আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, "যা যা, তোর এত খবরে দরকার কী।"

এইবার সৎপাত্রে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ, ভোজের আয়োজন প্রচুর করিলাম। বাড়িতে গৃহিণী নাই, প্রতিবেশীরা দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে আসিল। সর্বস্বান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্রি খাটিতে লাগিল।

গায়ে-হলুদের দিনে রাত তিনটার সময় শশীকে ওলাউঠায় ধরিল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর নিস্ফল ঔষধের শিশিগুলা ভূতলে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিলাম। কহিলাম, "মাপ করো দাদা, এই পাষণ্ডকে মাপ করো। আমার একমাত্র কন্যা, আমার আর কেহ নাই।"

হরিনাথ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু, করেন কী, করেন কী। আপনার কাছে আমি চিরঋণী, আমার পায়ে হাত দিবেন না।"

আমি কহিলাম, "নিরপরাধে আমি তোমার সর্বনাশ করিয়াছি, সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে।"

এই বলিয়া সর্বলোকের সমক্ষে আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "ওগো, আমি এই বৃদ্ধের সর্বনাশ করিয়াছি, আমি তাহার দণ্ড লইতেছি, ভগবান আমার শশীকে রক্ষা করুন।"

বলিয়া হরিনাথের চটিজুতা খুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিলাম, বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমার হাত হইতে জুতা কাড়িয়া লইল।

পরদিন দশটা-বেলায় গায়ে-হলুদের হরিদ্রাচিহ্ন লইয়া শশী ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

তাহার পরদিনেই দারোগাবাবু কহিলেন, "ওহে আর কেন, এইবার বিবাহ করিয়া ফেলো। দেখাশুনার তো একজন লোক চাই ?"

মানুষের মর্মান্তিক দুঃখশোকের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধা শয়তানকেও শোভা পায় না। কিন্তু, নানা ঘটনায় দারোগার কাছে এমন মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম যে, কোনো কথা বলিবার মুখ ছিল না। দারোগার বন্ধুত্ব সেই দিন যেন আমাকে চাবুক মারিয়া অপমান করিল।

হৃদয় যতই ব্যথিত থাক্‌, কর্মচক্র চলিতেই থাকে। আগেকার মতোই ক্ষুধার আহার, পরিধানের বস্ত্র, এমন-কি, চুলার কাষ্ঠ এবং জুতার ফিতা পর্যন্ত পরিপূর্ণ উদ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়।

কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাঝে মাঝে কানে সেই করুণ কণ্ঠের প্রশ্ন বাজিতে থাকে, "বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল।" দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের ব্যয়ে ছাইয়া দিলাম, আমার দুগ্ধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, তাহার বন্ধকি জোতজমা মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

কিছুদিন সদ্যশোকের দুঃসহ বেদনায় নির্জন সন্ধ্যায় এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলই মনে হইত, আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠুর দুষ্কর্মে পরলোকে কোনোমতেই শান্তি পাইতেছে না। সে যেন ব্যথিত হইয়া কেবলই আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেছে, বাবা, কেন এমন করিলে।

কিছুদিন এমনি হইয়াছিল, গরিবের চিকিৎসা করিয়া টাকার জন্য তাগিদ করিতে পারিতাম না।

কোনো ছোটো মেয়ের ব্যামো হইলে মনে হইত আমার শশীই যেন পল্লীর সমস্ত রুগ্‌ণা বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে।

তখন পুরা বর্ষায় পল্লী ভাসিয়া গেছে। ধানের খেত এবং গৃহের অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া নৌকায় ফিরিতে হয়। ভোররাত্রি হইতে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, এখনো বিরাম নাই।

জমিদারের কাছারিবাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাবুদের পান্সির মাঝি সামান্য বিলম্বটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি।

ইতিপূর্বে এরূপ দুর্যোগে যখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল যে আমার পুরাতন ছাতাটি খুলিয়া দেখিত তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না, এবং একটি ব্যগ্র কণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও বৃষ্টির ছাঁট হইতে সযত্নে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে বারম্বার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শূন্য নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহময় মুখখানি স্মরণ করিয়া একটুখানি বিলম্ব হইতেছিল। তাহার রুদ্ধ শয়নঘরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না তাহার সুখের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শূন্য ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া বুকের মধ্যে হু হু করিতে লাগিল। বাহিরে বড়োলোকের ভৃত্যের তর্জনস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সংবরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

নৌকায় উঠিবার সময় দেখি, থানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা, একজন চাষা কৌপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী রে।" উত্তরে শুনিলাম গতরাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূরগ্রাম হইতে বহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম, সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবস্ত্র খুলিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারি কাছারির অসহিষ্ণু মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তখনো সেই লোকটা বুকের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে ; দারোগাবাবুর দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রন্ধন-অন্নের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম। সে তাহা ছুঁইল না।

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগীর তাগিদে পুনর্বার বাহির হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনো লোকটা একেবারে অভিভূতের মতো বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে, এই নদী, ঐ গ্রাম, ঐ থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মতো। বারম্বার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম, একবার একজন কন্‌স্টেবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ট্যাঁকে কিছু আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতান্তই গরিব, তাহার কিছু নাই। কন্‌স্টেবল বলিয়া গেছে, "থাক্ বেটা, তবে এখন বসিয়া থাক্।"

এমন দৃশ্য পূর্বেও অনেকবার দেখিয়াছি, কখনো কিছুই মনে হয় নাই। আজ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার শশীর করুণা-গদ্‌গদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদলার আকাশ জুড়িয়া বাজিয়া উঠিল। ঐ কন্যাহারা বাক্যহীন চাষার অপরিমেয় দুঃখ আমার বুকের পাঁজরগুলাতে যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

দারোগাবাবু বেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন। তাঁহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয় মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন ; তিনি মাদুরের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আপনারা মানুষ না পিশাচ ?" বলিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জনের টাকা ঝনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম, "টাকা চান তো এই নিন, যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন ; এখন এই লোকটাকে ছুটি দিন, ও কন্যার সৎকার করিয়া আসুক।"

বহু উৎপীড়িতের অশ্রুসেচনে দারোগার সহিত ডাক্তারের যে প্রণয় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি, তাঁহার মহদাশয়তার উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের বুদ্ধিভ্রংশ লইয়া অনেক আত্মধিক্কার প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু শেষটা ভিটা ছাড়িতে হইল।